স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

হাইপারথাইরয়েডিজম

ডাঃ মোঃ বদরুল ইসলাম, আইসিডিডিআর,বি

ডাঃ তাহমিনা ইসলাম, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র আনিস। এবছর তার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার কথা। ভার্সিটির প্রথম বছরটা তার স্বপ্নের মতো কেটেছে। তবে এর পর থেকেই সে বেশ অসুস্থ। প্রায়ই গায়ে জ্বর থাকে। শরীরের ওজনও কমে গেছে। অতিরিক্ত শুকানোর কারণেই হয়তো চোখগুলো অস্বাভাবিক বড় মনে হয়। ডাক্তারদের জোরালো সন্দেহ ছিলো আনিসের টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষা হয়েছে। ছয় মাস যক্ষার ওষুধও সে নিয়মিতই খেয়েছে কিন্তু কোনো উন্নতি হয় নি। শরীর শুকিয়েই চলেছে। ইদানিং প্রায়ই তার ডায়রিয়া হচ্ছে। একটাই আশার কথা তার খাবারের রুচি ঠিক আছে। বরং সে আগের থেকে একটু বেশিই খেতে পারে। একসময় বন্ধুরা ওকে ফ্যাট ম্যান বলে উত্যক্ত করতো।

গেল একটা বছর কোনো কিছুতেই সে মন বসাতে পারছে না। প্রায় রাতেই তার ভালো ঘুম হয় না। ডাক্তারদের এও সন্দেহ ছিলো যে, সে বিষণ্নতায় আক্রান্ত। আনিস অবাক হয়ে ভাবে তারতো কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কেন সে বিষণ্নতায় ভুগবে? বাসায় এবং সহপাঠীদেরও ধারণা ছিলো আনিস কিছু গোপন করছে। প্রেমঘটিত কানাঘুষা থেকে শুরু করে আনিস নেশাখোর এমন অপবাদও তাকে শুনতে হয়েছে। মাসকয়েক আগে যখন অতিরিক্ত বুক ধড়ফড়ানি শুরু হলো তখন সে ইউনিভার্সিটির হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলো। তখন ডাক্তাররা বললেন ওর অ্যাংজাইটি নিউরোসিস হয়েছে। তারা ওষুধও দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যখন দৌড়ে তিন তলার পরীক্ষার হলে ওঠার সময় আনিস অজ্ঞান হয়ে যায়। ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তাররা বললেন ওর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হৃদযন্ত্রের অতি দ্রুত ও অনিয়মিত গতিই এর কারণ। অবশেষে ধরা পড়লো আনিস মারাত্মক হাইপারথাইরয়েডিজমে ভুগছে।

হাইপারথাইরয়েডিজম

শরীরের থাইরক্সিন বা থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য হলে তাকে হাইপারথাইরয়েডিজম বা থাইরোটক্সিকোসিস বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড যখন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করে তখন এই অবস্থার উদ্ভব হয়। তিনটি প্রধান কারণে এই অস্বাভাবিক মাত্রায় থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়।

১. গ্রেভস ডিজিজ

শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে স্ববিরোধী হয়ে ওঠে এবং আক্রমণ করে বসে নিজ শরীরকেই। গ্রেভস ডিজিজে আক্রান্ত রোগীদের শ্বেত কণিকা এক বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা অধিক পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য ক্রমাগত থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। ফলে শরীরে থাইরয়েডের আধিক্যজনিত উপসর্গ দেখা দেয়।

২. গলগণ্ড-পরবর্তী টক্সিক মাল্টিনডিউলার গয়টার

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাল্টিনডিউলার গয়টারের ক্ষেত্রে কোষের দ্রুত বিভাজনে ক্রোমজমেরও বিভাজন ঘটে এবং দ্রুত বিভাজনের ফলে গ্রন্থির কোনো কোনো স্থানে ক্রোমজমের জিনে পরিবর্তন বা মিউটেশন হতে পারে। এই কারণে সেসব স্থানের কোষগুলো

হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত রোগীর বিভিন্ন উপসর্গ

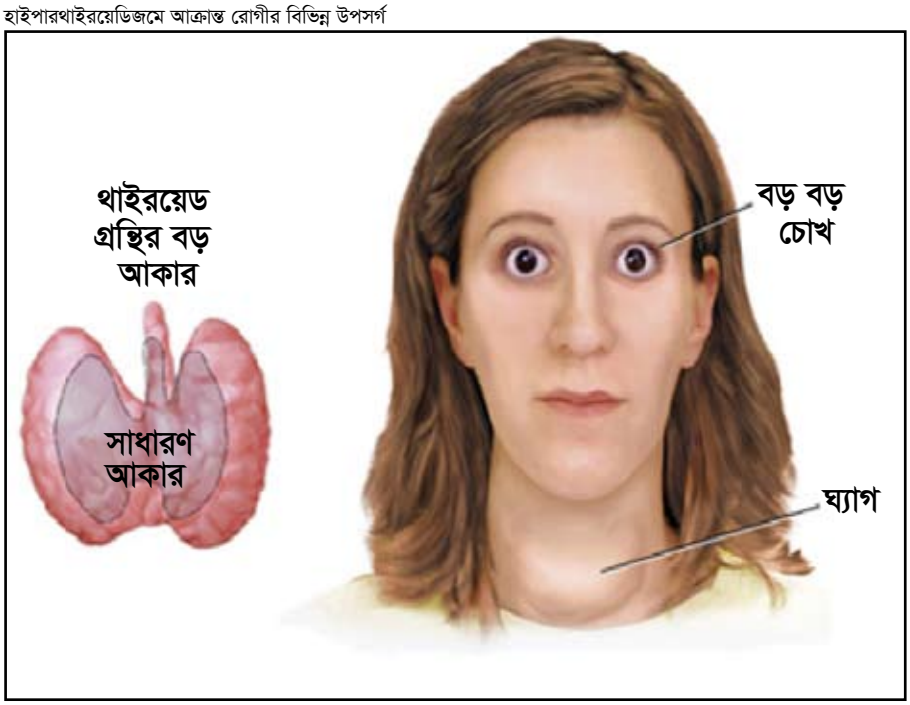

ভেতরের পাতায়

- সোয়াইন ফ্লু
- অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া
- কোল্ড সোর বা ঠাণ্ডায় ঠোঁট ফেটে যাওয়া

বর্ষ ২৪ | সংখ্যা ১

শ্রাবণ ১৪২২ | আগস্ট ২০১৫

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	অধ্যাপক জন ডি. ক্লেমেন্স
উপ-প্রধান সম্পাদক	ডাঃ প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

ডাঃ রুখসানা গাজী, ডাঃ মোঃ ইকবাল, ড. রুবহানা রকিব, ডাঃ এসএম রফিকুল ইসলাম, ড. শামসুন নাহার, ডাঃ মারুফা সুলতানা

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত রোগী এভাবে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে

অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, শরীরের বাড়তি চাহিদা ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বা আয়োডিনের চাহিদা মেটানো হলেও। যার ফলে গ্রন্থি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এবং একসময় গলার সামনে অতিরিক্ত মাংসপিণ্ডের আকার নেয়, যাকে আমারা গলগণ্ড বা ঘ্যাগ বলি। শুধু যে গ্রন্থিটি আকারে অতিকায় হয়ে ওঠে তা নয়, এটি বাড়তি থাইরয়েড হরমোনও তৈরি করতে থাকে। ফলস্বরূপ রোগী থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত হতে পারে।

৩. সাবক্লিনিক্যাল থাইরোটক্সিকোসিস বা অপ্রকাশিত থাইরোটক্সিকোসিস

প্রায়শই কোনো রকম উপসর্গ ছাড়াই রক্তে হরমোনের মাত্রা অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে গলগণ্ড বা মাল্টিনডিউলার গয়টারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার আগের অবস্থা এটি। এই রোগীদের রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার ওপরের সীমানায় এবং থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টিএসএইচ)-এর মাত্রা খুবই কম বা প্রায় অনুপস্থিত থাকে। এদের হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত দ্রুতগতি বা হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশংকা বেশি থাকে।

উপরোক্ত অবস্থাসমূহে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে, কেননা পরবর্তীতে এই অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে পুরোপুরি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

লক্ষণ

হাইপারথাইরয়েডিজম বা থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর ওজন দ্রুত কমতে থাকে, যদিও তার খাবারের রুচি স্বাভাবিক বা বেশিও থাকতে পারে। রোগী গরম সহ্য করতে পারে না এবং তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা যায়। ডায়রিয়া বা ঘনঘন পায়খানাও হতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকে বলে রোগী দীর্ঘ সময় ধরে জ্বরের কথা বলে। শারীরিক পরীক্ষায় রোগীর অস্বাভাবিক দ্রুত নাড়ীর গতি এবং হৃদস্পন্দন দেখা যায়। নাড়ীর গতি অনিয়মিতও হতে পারে যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশান বলে। কারণভেদে থাইরয়েড গ্রন্থির আকার বিভিন্ন রকম হয়, তবে সবসময় এটি বড় নাও হতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি খানিকটা বড় হতে পারে, তবে এই অসুখের অন্যতম লক্ষণ ধরা পড়ে রোগীর চোখে। চোখ দু'টো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। চোখের পেছনের প্রদাহের ফলে কোষকলার অস্বাভাবিক স্ফীতির কারণে এমন হয়। রোগীকে দেখলে মনে হয় যে সে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। এই অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে চোখের স্নায়ু নষ্ট হয়ে রোগী দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে।

একটি জরুরি অবস্থা

মাত্রাতিরিক্ত থাইরয়েড ও হরমোনজনিত বিষক্রিয়া বা থাইরয়েড স্টর্ম

এটি রোগীর জন্য অত্যন্ত খারাপ একটি অবস্থা। সাধারণত থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত কোনো রোগী যদি যথাযথ হরমোন চিকিৎসা না পায় কিংবা চিকিৎসাহীন থাকে তখন শরীরে জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে এই মারাত্মক অবস্থা ঘটতে পারে। এছাড়াও, রেডিও-আয়োডিন দ্বারা চিকিৎসা কিংবা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অপারেশনের আগে অসম্পূর্ণ প্রস্তুতির কারণেও এটি হতে পারে। থাইরয়েড স্টর্মে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার আদর্শ স্থান নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউ। এসব রোগীদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং নাড়ীর গতি হয় অস্বাভাবিক রকম বেশি ও অনিয়মিত। রোগী মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চেতনার তারতম্য হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সাধারণত রোগীর মধ্যে থাইরোটক্সিকোসিসের অন্যান্য উপসর্গও থাকে। বয়স্ক রোগীদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এসব রোগীর

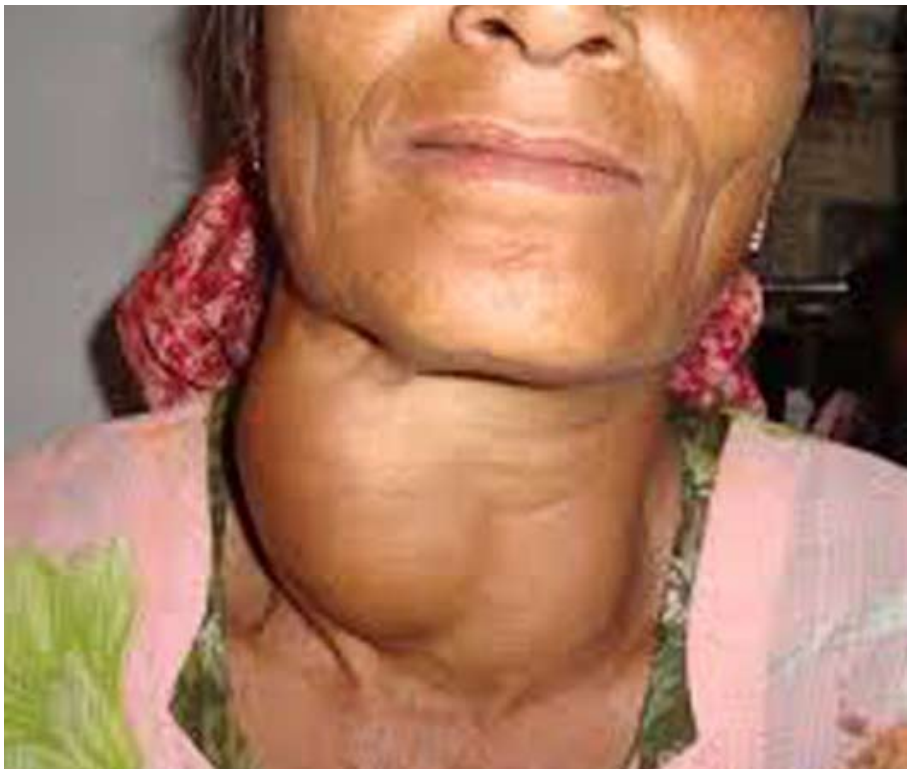
গলগণ্ড বা ঘ্যাগ

শরীরে পানিস্বল্পতা থাকে। ফলে চিকিৎসার সময় এদের শিরাপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন দিতে হয় এবং যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিকেরও প্রয়োজন হয়। নাড়ীর গতি কমানোর জন্য বিটাব্লকারজাতীয় ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। অতিরিক্ত থাইরয়েড হরমোনের রক্তে নির্গমন প্রতিরোধের জন্য সোডিয়াম আয়পোডেট বা পটাসিয়াম আয়োডাইড দিতে হয়। হরমোনের উৎপাদন বন্ধের জন্য থাইরয়েড হরমোন প্রস্তুত-নিরোধী ওষুধ, যেমন কার্বিমাজল দেওয়া হয় যা পরবর্তীতে রোগীকে দীর্ঘ সময় খেতে হয়।

এখানে লক্ষণীয়, উপরোক্ত অবস্থা রোগ নির্ণয়ের অভাব বা অপর্যাপ্ত চিকিৎসার ফলাফল। কাজেই যথাসময়ে রোগ নির্ণয় খুবই জরুরি।

রোগনির্ণয়

রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা এবং থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনের মাত্রাই থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতার প্রধান মাপকাঠি। শুধুমাত্র রোগ নির্ণয়ই নয় চিকিৎসার কার্যকারিতা নিরূপণেও এর যথাযথ ব্যবহার রয়েছে। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন এবং থাইরয়েড হরমোনের দু'টি যৌগ যথাক্রমে থাইরক্সিন (T4) ও ট্রাইআয়োডো-থাইরনিন (T3) যা রক্তে মাপা হয়।

হাইপারথাইরয়েডিজম নির্ণয়ের আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া হলো:

১. থাইরয়েড স্ক্যান

এই পরীক্ষায় রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে থাইরয়েড গ্রন্থির বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতার একটি হিসাব পাওয়া যায়, বিশেষ করে গ্রন্থির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ গ্রন্থিটিই অতিমাত্রায় সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় কি না তা বোঝা যায়। রোগের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

২. গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবডিসমূহ সনাক্তকরণ

রোগীর রক্তে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন রিসেপ্টর অ্যান্টিবডির অস্বাভাবিক উপস্থিতি গ্রেভস ডিজিজ সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। শতকরা ৮০ থেকে ৯৫ ভাগ গ্রেভস ডিজিজ আক্রান্ত রোগীদের রক্তে এই অ্যান্টিবডি থাকে।

৩. এফএনএসি (ফাইন নীডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি)

নডিউলার বা মাল্টিনডিউলার গয়টার থেকে থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার পৃথকীকরণের জন্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে কোষকলা সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

হাইপারথাইরয়েডিজমের চিকিৎসা নির্ভর করে রোগীর বয়স এবং আক্রান্ত হওয়ার কারণের ওপর। কারণভেদে থাইরয়েড-নিরোধী বা

অ্যান্টিথাইরয়েড জাতীয় ওষুধ, রেডিও-অ্যাকটিভ আয়োডিন অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অপারেশনের প্রয়োজন পড়তে পারে। রোগ নির্ণয়ের শুরুতে রোগীর অত্যাধিক বিপাকক্রিয়া কমানোর জন্য প্রপ্রানলল বা বিটাব্লকারজাতীয় ওষুধ স্বল্প সময়ের জন্য প্রয়োজন হয়।

দু'টি অবস্থার চিকিৎসা কিছুটা বিশদভাবে বলা হলো:

গ্রেভস ডিজিজ

প্রথমবার এ রোগে আক্রান্ত হলে ৪০ বছরের কমবয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে থাইরয়েড-নিরোধী ওষুধ যেমন কার্বিমাজল বা প্রপাইল থায়োইউরাসিল দিয়ে এক থেকে দেড় বছর চিকিৎসা করতে হয়। শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে এরপর রোগীদের ওষুধ খেতে হয় না; তারা সুস্থ হয়ে যায়। তবে ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসা শেষের দুই বছরের মাথায় পুনরায় অসুখটি ফিরে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে রেডিওঅ্যাকটিভ আয়োডিন দিয়ে অথবা অপারেশন করে চিকিৎসা করতে হয়। তবে ৪০ বছরের বেশি বয়সের রোগীদের জন্য এ রোগের শুরুতেই রেডিওআয়োডিন চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয় হলো, রেডিওঅ্যাকটিভ আয়োডিন দ্বারা চিকিৎসা বা অপারেশনের পর দীর্ঘমেয়াদে রোগীর হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং রোগীর দীর্ঘমেয়াদী থাইরক্সিন হরমোনের প্রয়োজন হতে পারে।

থাইরয়েড-নিরোধী ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কারণ এই ওষুধগুলো শ্বেতকণিকা কমিয়ে রোগীকে মারাত্মক ইনফেকশন এর ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। একারণে এই ওষুধ সেবনরত অবস্থায় কোনো রকম জ্বর, গলার প্রদাহ অথবা অন্য কোনো ইনফেকশনের লক্ষণ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অপারেশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই অপারেশনের আগে রোগীকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতে হবে। অস্বাভাবিক মাত্রায় হরমোন প্রস্তুত করতে থাকা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটিতে যদি অপারেশন করা হয় তখন আরো বেশি মাত্রায় থাইরয়েড হরমোন গ্ল্যান্ড থেকে রক্তে মিশে থাইরয়েড বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বা থাইরয়েড ক্রাইসিস ঘটে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। একারণে রোগীকে অপারশেনের আগে দুই সপ্তাহ আয়োডিন সলিউশন (পটাসিয়াম আয়োডাইড) নির্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়াতে হয়। এতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটি ছোট হয়ে আসে এবং অতিরিক্ত হরমোন নির্গমন বন্ধ হয় এবং গ্ল্যান্ডটিতে অতিরিক্ত রক্তপ্রবাহ কমে আসে। এতে অপারেশনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মাল্টিনডিউলার গয়টার

অস্বাভাবিক বড় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটি দৃষ্টিকটু এবং এর অতিরিক্ত ওজন রোগীর জন্য কষ্টকর। এমনকি এটি পেছনের শ্বাসনালীকে চাপ দিয়ে রোগীর শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীর থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও উপরোক্ত কারণে অপারেশন করে আংশিক গ্রন্থি ফেলে দিতে হয়। তবে এ-জাতীয় রোগীদের ভবিষ্যতে থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভবিষ্যতে রোগী থাইরোটক্সিকোসিসে আক্রান্ত হলে থাইরয়েড-নিরোধী ওষুধ ব্যবহারে সাময়িকভাবে রোগের উপশম হলেও ওষুধ বন্ধ করলে পুনরায় রোগী হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে রেডিও-আয়োডিন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয় এবং পরবর্তীতে অপারেশন করে আংশিক গ্ল্যান্ড ফেলে দেওয়া হয়। গ্রেভস ডিজিজের মতো রেডিও আয়োডিন দিয়ে চিকিৎসা করলে পরবর্তীতে হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

গর্ভাবস্থায় হাইপারথাইরয়েডিজম

গর্ভাবস্থায় যে শিশুর থাইরোটক্সিকোসিস হয় তা সাধারণত মায়ের গ্রেভস ডিজিজ থেকে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মা ও শিশু উভয়েই ঝুঁকিতে থাকে কেননা মায়ের অতিরিক্ত হরমোন গর্ভফুল অতিক্রম করে শিশুর মধ্যে হাইপারথাইরয়েডিজম সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া ক্ষতিকর অ্যান্টিবডি যা মায়ের রক্তে থাকে তাও শিশুকে আক্রান্ত করে থাকে। চিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হতে হয় কারণ বহুল প্রচলিত ওষুধ কার্বিমাজল দিয়ে মাকে চিকিৎসা করলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রপাইল থায়োইউরাসিল নামক একটি বিশেষ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা ভালো। শিশু প্রসবের পরও প্রয়োজন হলে এই ওষুধটিই ব্যবহার করা উচিত কারণ মায়ের দুধে এটির নির্গমন মাত্রা কার্বিমাজলের থেকে অনেক কম থাকে, যা শিশুর জন্য ক্ষতিকর নয়।

জন্মগত হাইপারথাইরয়েডিজম

গ্রেভস ডিজিজে আক্রান্ত মায়েদের গর্ভজাত শিশুদের প্রতি ১০০ জনে ২ জনের জন্মগত হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। শিশুর জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। মায়ের রক্তের থাইরয়েড রিসেপ্টর বাইন্ডিং অ্যান্টিবডি গর্ভফুল অতিক্রম করে শিশুর দেহে পৌঁছালে এ-অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ-রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ শিশুরই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটি বড় থাকে। এছাড়া অস্বাভাবিক দ্রুত নাড়ীর গতি, অস্থিরতা ও খিটখিটে ভাব, ছোট আকারের মাথা, চোখ কোটর থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসা, পর্যাপ্তভাবে খাবার খাওয়ার পরও ওজন কমতে থাকা, সবসময় শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকা, ইত্যাদি এ-রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণগুলো দেখা গেলে (বিশেষ করে গ্রেভস ডিজিজে আক্রান্ত মায়েদের শিশুদের ক্ষেত্রে) অবশ্যই শিশুর রক্তে থাইরয়েড হরমোন এবং থাইরয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টিবডির মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। এই দুইয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জন্মগত হাইপারথাইরয়েডিজম বা জন্মগত গ্রেভস ডিজিজকে সনাক্তকরণ নিশ্চিত করে। রোগ সনাক্ত হলেই অ্যান্টিথাইরয়েড ওষুধ এবং স্টেরয়েড দিয়ে এর চিকিৎসা করাতে হবে। শিশুর হৃদযন্ত্রের গতি কমানোর জন্য বিটাব্লকারজাতীয় ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। আশার কথা, এই জন্মগত গ্রেভস ডিজিজ ক্ষণস্থায়ী। ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে শিশুর শরীরে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায় যা নিয়মিত শিশুর রক্তে হরমোনের মাত্রা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়। স্বল্পসংখ্যক শিশুর ক্ষেত্রে এ-অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, আর তখন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এ-রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্মের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথে চিকিৎসা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ এই সময়ে চিকিৎসা না দিলে শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা শিশু স্থায়ীভাবে হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত হতে পারে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের হার আমাদের সমাজে কম নয়। এর ক্ষুদ্র একটি অংশই সাধারণত চিহ্নিত হয়ে থাকে। এ-রোগ মানুষের সাধারণ কর্মক্ষমতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। হাইপারথাইরয়েডিজমের উপসর্গ বহুমুখী ও বিচিত্র। এই কারণে এ-রোগের ব্যাপারে সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে থাইরয়েড ফাংশান টেস্ট একটি রুটিন পরীক্ষা। আমাদের দেশেও একটি রুটিন পরীক্ষার মাধ্যমে হাইপারথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা যেতে পারে। ■

সোয়াইন ফ্লু

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি

ভারত বাংলাদেশের অত্যন্ত ঘনিষ্ট প্রতিবেশী রাষ্ট্র। শুধু দক্ষিণ দিক বাদে অন্য সবদিকেই ভারতের অবস্থান। সুতরাং ভারতে, বিশেষ করে সেখানকার বাংলাদেশ সীমান্তে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে তার প্রভাব বাংলাদেশে প্রায় অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি ভারতে ২০০৯-এর পর আবার নতুন করে ঘটে যাওয়া সোয়াইন ফ্লু-র প্রাদুর্ভাব আমাদেরকেও তাই এ-রোগ সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছে।

সোয়াইন ফ্লু মূলত শুকর থেকে ছড়ায় বলে বহুপূর্বে ধারণা করা হতো এবং সে সময় যারা শুকর লালন-পালনের কাজে সরাসরি যুক্ত ছিলো তাদের এ-রোগ বেশি হতো। কিন্তু এখন শুকর বা তাদের কাছ থেকে শত মাইল দূরের কোনো ব্যক্তিরও এ রোগ হতে পারে। আজকের দিনে এটি খুবই মারাত্মক রোগ যা পশু থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। সম্প্রতি এ-রোগের আক্রমণে ভারতে দু'হাজারেরও বেশি লোকের প্রাণহানি ঘটেছে আর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মৃতদের প্রায় ২০ গুণের সমান। আইইডিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে বাংলাদেশে এবছর তিনজন সোয়াইন ফ্লু-র রোগী সনাক্ত করা হয়েছে (*ঢাকা ট্রিবিউন*, ৮ মার্চ ২০১৫)।

সোয়াইন ফ্লু মূলত শ্বাসতন্ত্রের রোগ যা টাইপ-এ ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্বারা হয়। এই ভাইরাস সর্বপ্রথম মেক্সিকোতে সনাক্ত হয় ২০০৯ সালে, যে কারণে এ-রোগ মেক্সিকো ফ্লু নামেও পরিচিতি পায়। পরে অবশ্য তা সোয়াইন ফ্লু নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। সোয়াইন ফ্লু মেক্সিকোতে হঠাৎ করে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ রোগটি তখন সেখানে নতুন হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কারণে এটি প্রতিরোধ করার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এরপর রোগটি মহামারী আকারে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১০ সালের আগষ্ট মাসে এ-রোগের মহামারী আর নেই বলে ঘোষণা করে, তথাপি বিশ্বের অনেক দেশে এটি এখনো সিজনাল ফ্লু হিসেবে মানুষকে আক্রমণ করছে।

লক্ষণ

সোয়াইন ফ্লু-র লক্ষণ মূলত অন্যান্য ফ্লু-র মতোই, যেমন জ্বর, কাশি, সর্দি, শরীর ব্যথা, অবসাদ, মাথাব্যথা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, এবং কখনো কখনো ডায়রিয়া ও বমি হওয়া। আক্রান্ত হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই লক্ষণ দেখা দেয় এবং সাত দিন স্থায়ী হয়। সাধারণত একজন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান মানুষের ক্ষেত্রে এ-রোগ কোনো জটিলতা সৃষ্টি করে না তবে গর্ভবতী মা বা হৃদরোগী বা অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে H1N1 (সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস) নাক, গলা, ও ফুসফুসের লাইন কোষকে আক্রান্ত করে এবং সাধারণত হাঁচি, কাশি থেকে এ-রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়ায়।

চিকিৎসা

সাধারণত এই রোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না, তবে আক্রান্ত ব্যক্তির কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। যেমন:

- প্রচুর বিশ্রাম নেওয়া
- প্রচুর পরিমানে পানিসহ অন্যান্য পানীয় যেমন ডাবের পানি, আখের রস, ইত্যাদি পান করা
- জ্বরে মাথাব্যথা বা ঝিমঝিম করলে হালকা ভেজা পরিস্কার তোয়ালে ঘাড়ে রাখলে আরাম বোধ হয়
- সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ঘরে অবস্থান করা ভালো
- গলা ব্যথা হলে লবণ পানি (১:১) দিয়ে গড়গড়া করলে আরাম পাওয়া যায়
- বেশি ঠাণ্ডার মধ্যে থাকা ঠিক নয়

তবে জ্বর এবং কাশি থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে এবং চিকিৎসক যদি সেকেন্ডারি ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন তাহলে রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিকও দিতে পারেন। বাংলাদেশে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ এর ব্যবহার একেবারে নেই বললেই চলে। উন্নত বিশ্বে ফ্লু-র জন্য কিছু ওষুধ পাওয়া যায়, তবে এসব ওষুধ প্রাপ্তবয়স্ক এবং এক বছর বা তার চেয়ে বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমেরিকায় ফ্লু-র জন্য দুই ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়, যা সে দেশের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন:

১. ওসেলটামিভির (ট্যামিফ্লু)

২. জানামিভির (রেলেনজা)

প্রতিরোধ

১. সোয়াইন ফ্লু-র রোগীকে যতটা সম্ভব অন্যদের থেকে বিশেষ করে ছোট শিশুদের থেকে আলাদা রাখা উচিত

২. আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে এসে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেললে জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকে

৩. ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে নাক পরিষ্কার করে রাখা উচিত

৪. বাসায় দুটো টয়লেট থাকলে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য একটি টয়লেট আলাদা করে ফেলা উচিত এবং কফ বা থুথু টয়লেটের মধ্যে ফেলে পানি

ঢেলে পরিষ্কার করে ফেলা উচিত এবং কখনো উন্মুক্ত স্থানে কফ, কাশি বা থুথু ফেলা উচিত নয়

টিকা

সোয়াইন ফ্লু-র টিকা সারা বিশ্বে পাওয়া গেলেও কিছু উন্নত ধনী দেশ ছাড়া সব দেশে তা সহজলভ্য নয়। আমেরিকায় সোয়াইন ফ্লু-র টিকা বহুল প্রচলিত। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নতুন সোয়াইন ফ্লু-র টিকা অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশেও সোয়াইন ফ্লু-র টিকা পাওয়া যায়, তবে তা তেমন সহজলভ্য নয়। ■

সোয়াইন ফ্লু-র টিকা দেওয়া হচ্ছে

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির পাভেল, পাবনা মেডিকেল কলেজ

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এক ধরনের জটিল রক্তস্বল্পতা। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অপরিচিত কোনো রোগ নয়। বাংলাদেশে এই রোগের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না-থাকলেও অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার অনেক রোগী আছে। আমাদের দেহে রক্ত তৈরির কারখানা হচ্ছে অস্থিমজ্জা। অস্থির ভেতরে থাকে অস্থিমজ্জা। যখন এই অস্থিমজ্জা নষ্ট হয়ে যায় বা অস্থিমজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগটি দেখা দেয়।

যেকোনো বয়সেই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। ধীরে ধীরে এ-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। অস্থিমজ্জা থেকে তিন ধরনের রক্তকণিকা তৈরি হয়। এসব রক্তকণিকার মধ্যে রয়েছে লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা। প্রতিটি রক্তকণিকার ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে রক্তকণিকাগুলো সংখ্যায় অনেক কমে যায়। তাই এসব রক্তকণিকা যেসব কাজ করে তা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে দেখা দেয় বিভিন্ন জটিলতা।

রোগের কারণ

প্রত্যক্ষ কারণঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার প্রাইমারি বা প্রত্যক্ষ কারণ বোঝা যায় না। রোগের আসল কারণ জানতে না-পারার এই বিষয়টিকে বলা হয় ইডিওপ্যাথিক ইটিওলজি। আবার অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত ত্রুটি হিসেবে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া দেখা দেয়, যাকে বলা হয় ফ্যানকনি অ্যানিমিয়া।

পরোক্ষ কারণঃ সেকেন্ডারি বা পরোক্ষ কারণেও অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়। পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে আণবিক বিকিরণ, রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ, বিভিন্ন ওষুধের ব্যবহার, ভাইরাল হেপাটাইটিস, গর্ভাবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ। বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ডিডিটি, বেনজিন, টিএনটি প্রভৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, যেমন ক্লোরামফেনিকল, ক্লোরপ্রমাজিন, টলবুটামাইড, ইন্ডোমেথাসিন, কার্বামাজেপিন, হাইড্রালাজিন প্রভৃতির মাধ্যমেও এই রোগ হতে পারে।

রক্ত উৎপন্নকারী অস্থিমজ্জা

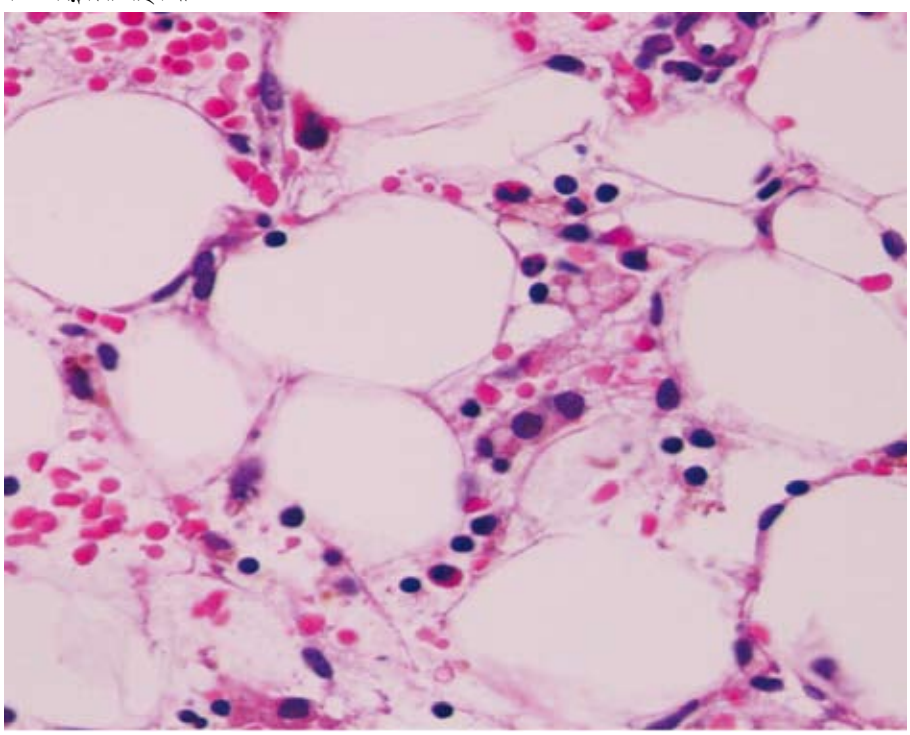

উপসর্গ

এই রোগে যেসব লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো:

- শারীরিক দুর্বলতা
- অবসাদগ্রস্ততা
- মাথাব্যথা
- মাথা-ঘোরা
- অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে-যাওয়া
- কাশি
- জ্বর
- গলাব্যথা
- মুখে প্রদাহ
- শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তপাত হওয়া, যেমন দাঁতের মাড়ি ও নাক থেকে এবং কাশি, বমি এবং প্রস্রাবের সাথে। মলদ্বার দিয়েও রক্তপাত হতে পারে, এমনকি শরীরের ত্বকের নিচেও রক্তক্ষরণ হতে পারে
- অনেক সময় ত্বকের নিচে মশার কামড়ের মতো দাগ দেখা যায়

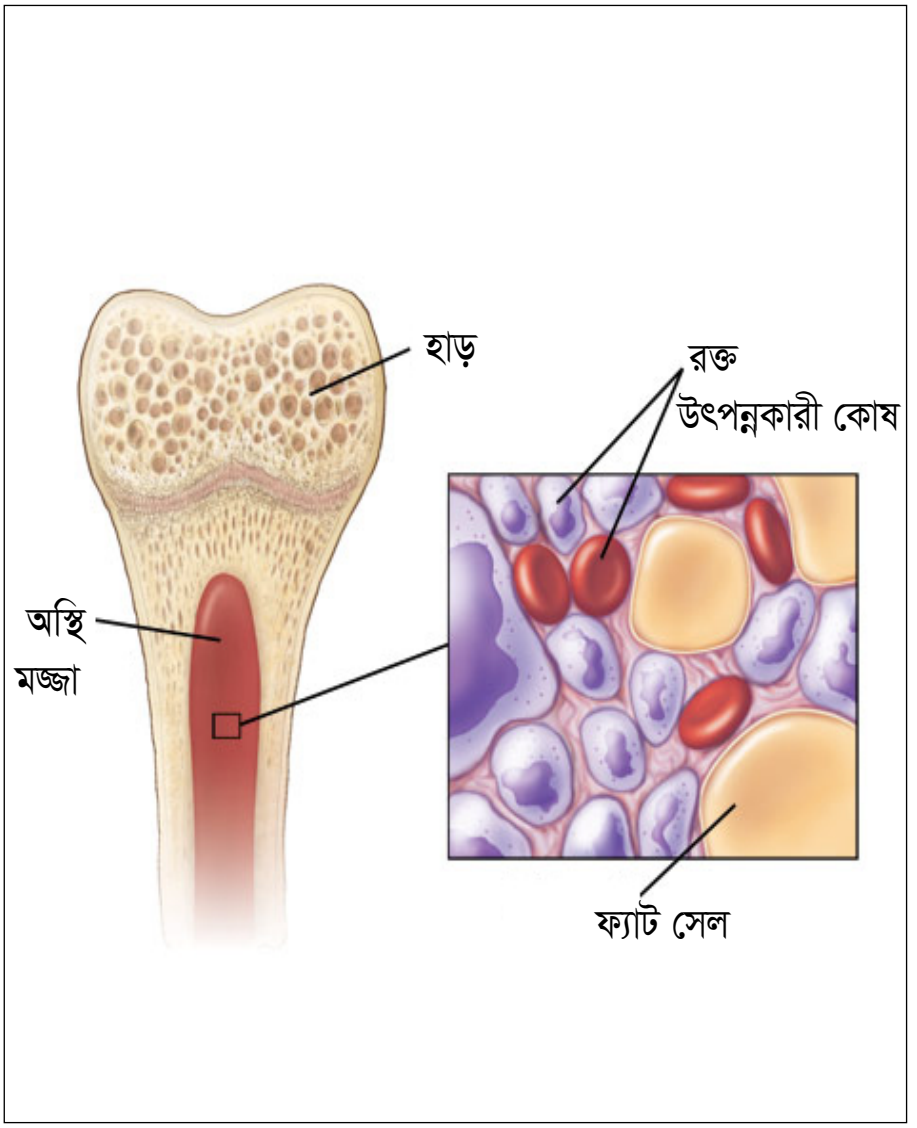

রোগনির্ণয়

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার রোগনির্ণয় বা ডায়াগনসিস খুব কঠিন নয়। রোগের লক্ষণ দেখেই রোগটি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রোগীর কাছ থেকে ভালোভাবে রোগের ইতিহাস জানতে পারলে এবং শারীরিক পরীক্ষা করলে রোগ সনাক্ত করা অনেক সহজ হয়। রোগী সত্যিকার অর্থে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকলে রক্ত পরীক্ষায় তার হিমোগ্লোবিন কম দেখা যায়। এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য অস্থিমজ্জাও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগীদের রক্ত পরিসঞ্চালন করে চিকিৎসা করা হয়। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণত তা খুব ফলপ্রসূ হয় না; প্রায় ৫০%-এর বেশি রোগী মৃত্যুবরণ করে। তবে, ৩০ বছরের কমবয়সী অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগীর ক্ষেত্রে সফলভাবে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বা বোনম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন করতে পারলে সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। যাদের বয়স বেশি তাদের সাইক্লোস্পোরিন এবং এন্টিথাইমোসাইট গ্লোবিউলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তবে, এসব চিকিৎসায় রোগীর মধ্যে অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অত্যন্ত কঠিন একটি রোগ। এ-রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি আরোগ্যলাভের সম্ভাবনাও বেশ কম। তাই প্রতিরোধের দিকে নজর দেওয়াই উত্তম। যেসব রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসার ফলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেসব পদার্থ ব্যবহারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এসব পদার্থ ব্যবহারে বা এগুলো নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকে তা করা উচিত। কেউ এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হলে একজন ডিগ্রীধারী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া হঠাৎ করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেসব ওষুধ ব্যবহারের ফলে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে সেসব ওষুধ কখনো রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। এক্সরে বা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থও অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ঘটাতে পারে। সুতরাং, এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মনে রাখতে হবে একটু সচেতনতাই আমাদেরকে অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। ■

কোল্ড সোর বা ঠাণ্ডায় ঠোঁট ফেটে যাওয়া

ডাঃ সৈয়দা সাদিয়া ফারজানা, আইসিডিডিআর,বি

ঠাণ্ডায় অনেকের ঠোঁট ফেটে যেতে দেখা যায়। প্রথমে একধরনের চুলকানির মতো বোধ হয়, তবে তা দেখা যায় না। দু-একদিনের মধ্যে ওই জায়গাটিতে লাল রঙের একধরনের ফোস্কা পড়ে এবং পরে তা ফেটে যায়। একে বলা হয় কোল্ড সোর। এটি থেকে খুব দ্রুত পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

হার্পিস সিম্প্লেক্স লাবিয়ালিস বা কোল্ড সোর মুখের অস্বস্তি সৃষ্টি করার একটি সাধারণ কারণ। প্রধানত হার্পিস সিম্প্লেক্স টাইপ-১ ভাইরাসের কারণে এটি ঘটে থাকে। এটি অত্যন্ত সংক্রামক একটি রোগ। রোগীর ত্বকের সাথে অপরের ত্বকের সংস্পর্শের মাধ্যমে এটি খুব সহজেই ছড়াতে পারে। এটি সবচেয়ে সংক্রামক হয়ে ওঠে তখন, যখন রোগীর ঠোঁটে ফোস্কা পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা শুকিয়ে না-যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে সংক্রমণ থাকে।

কোল্ড সোর যদিও প্রতিরোধ করা যায় না, তবে ঘনঘন হলে এর স্থায়িত্ব রোধ করা যেতে পারে।

লক্ষণ ও উপসর্গ

১. কোল্ড সোর হওয়ার আগে সাধারণত ঠোঁটে বা আক্রান্ত স্থানে সুড়সুড়ি, খোঁচা-খোঁচা ভাব এবং চুলকানির অনুভূতি হতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত অংশে লাল, পানি ভর্তি, ব্যথাযুক্ত ফোস্কা উঠতে পারে

২. প্রথমবার এটি হওয়ার পাশাপাশি জ্বর হতে পারে এবং ঘাড় ফুলে যেতে পারে। কিন্তু পরে এসব উপসর্গ আর দেখা যায় না

কী করা উচিত

সাধারণত সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে কোল্ড সোর নিজে থেকেই সেরে যায়, কিন্তু ব্যথা ও অস্বস্তি কমাতে যা করা যায় তা হলো:

১. ক্ষতের অংশে বরফ দেওয়া যেতে পারে

২. কোল্ড সোর হতে পারে এমন মনে হলে আগে থেকেই চিকিৎসকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ বা ক্রীম ব্যবহার করলে জটিলতা কম হতে পারে

৩. টক, ঝাল এবং এসিড সৃষ্টিকারী খাবার না-খাওয়া ভালো। এসব খাবার অস্বস্তি বাড়িয়ে দিতে পারে

প্রতিরোধ

- মাসিক, জ্বর, শারীরিক দুর্বলতা, এবং রোদের তাপ রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারে
- কোল্ড সোর একটি সংক্রামক রোগ। সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তির সান্নিধ্য থেকে অন্যদের নিরাপদ দূরত্বে থাকা উচিত। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহারের যেসব বস্তু মুখের সংস্পর্শে আসে, যেমন খাবার, তৈজসপত্র, তোয়ালে এবং ঠোঁট ফাটা প্রতিরোধকারী বাম ব্যবহার করা থেকে অন্যদের বিরত থাকা উচিত। আক্রান্ত ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত
- কোল্ড সোর হলে তা যেন মুখের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে না-পড়ে সেদিকে খোয়াল রাখতে হবে। আক্রান্ত স্থানে হাত লাগার পর চোখ এবং অন্যান্য সংবেদনশীল স্থানে যেন সেই হাতের স্পর্শ না-লাগে সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে
- কোল্ড সোরের আভাস পেলে বিশ্রামে থাকার চেষ্টা করুন
- প্রতিদিন ব্যায়াম, মেডিটেশন বা ইয়োগা করা উচিত
- রোদের সংস্পর্শ কোল্ড সোরের কারণ হিসেবে মনে হলে রোদে যাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আর যদি একান্তই যেতে হয় তাহলে টুপি এবং মাস্ক ব্যবহার করুন
- ফোস্কার ব্যথা কমানোর উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা বা কুসুম কুসুম গরম পানিতে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে স্যাক নেওয়া যেতে পারে
- ফোস্কা হাত দিয়ে ঘষা, চিমটি কাটা বা খোঁচা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন

১. কোল্ড সোরে আক্রান্ত হওয়ার পর ১০০ ডিগ্রি বা তার থেকে বেশি জ্বর এবং ঠাণ্ডা লাগা থাকলে

২. দু'সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কোল্ড সোর থাকলে বা বারবার আক্রান্ত হলে

৩. কোল্ড সোরে আক্রান্ত হওয়ার পর চোখে কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি থাকলে অথবা দৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কোল্ড সোর-সংশ্লিষ্ট চোখের প্রদাহ হলে

চিকিৎসা ও ওষুধ

কোল্ড সোরের ফলে ওঠা ফোস্কায় খুব জ্বালা-পোড়া করে, তবে এটি তেমন ক্ষতিকর নয়। দশ দিন পর এটি নিজে থেকেই সেরে যায়। শতকরা ৮০ ভাগ কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই রোগ একবার হলে তাদের শরীরে এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মে। এই ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবে জ্বর, মাসিক, সূর্যের আলো এবং শ্বসনতন্ত্রের উপরের অংশের সংক্রমণ এই ভাইরাসকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। যদি স্বল্প সময়ের বিরতি দিয়ে এটি বারবার ফিরে আসে তবে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত, যিনি চিকিৎসা বা প্রতিরোধের উপায় হিসেবে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিতে পারেন। কোল্ড সোর শুরু হওয়ার প্রথমদিকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ শুরু করলে এর স্থায়িত্ব ও ব্যথা কমে যেতে পারে। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান
যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।